International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

হালদিয়া মহকুমার ভাষার অন্বয়তত্ত্ব

Rabindranath Barui

Associate Professor, Kalna College

বাক্য

ভাষার সর্ববৃহত একক হল বাক্য৷ শব্দ যখন ভাষার হয়ে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তখন সে শব্দসমষ্টির বৃহত্তর গঠনকে বাক্য বলা হয় । বাক্য সম্পর্কিত আলোচনায় ঐতিহ্যগত ব্যকরণের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পরবর্তীকালের বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর কতগুলি পার্থক্য দেখা গেছে৷ বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনার আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কালের ব্যবধানে বাক্যের দু'টি সংজ্ঞা দিয়েছেন । প্রথম সংজ্ঞায় ভাষার বা বাক্যের ভাবের দিক প্রাধান্য পেয়েছে গঠনের দিক৷ বাক্যবিচার করতে গিয়ে ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের দৃষ্টিভঙ্গীতে বাক্যের অংশগুলির বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়৷ তখনই একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বাক্যের গঠন তত্ত্ব বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গীতে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত পদের সাজানোর উপরে গুরুত্ব পড়ে৷

বাক্যে ব্যবহৃত নানা পদের মধ্যে সংযোগে স্থাপনের উপাদানও তাদের অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে ভাষাবিদ সুকুমার সেন বাংলা বাক্যের সুনির্দিষ্ট পদবিধি নির্দেশ করেছেন । সেই পদবিধি অনুযায়ী বাক্যের গঠনে ব্যবহৃত নানা পদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট আছে৷ সেখান থেকে মোটামুটিভাবে বাংলা বাক্যের যে প্রাথমিক গঠন শৈলী পাওয়া যায় তাহল কর্তা – কর্ম ও ক্রিয়া । বাক্যের বিষয় ও বক্তার উদ্দেশ্যের তার তথ্য অনুযায়ী এই নিয়মের সামন্য রদবদল ঘটে । তবে সে পরিবর্তন খুববেশি নিয়মকে লঙ্ঘন করেনা৷ সংস্কৃত ভাষায় বাক্যের যেকোন অবস্থানে কর্তা ক্রিয়া থাকনা কেন তার অর্থগত কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না৷

বাংলা বাক্য সে তুলনায় একটু স্বতন্ত্র৷ কর্তা – কর্ম ও ক্রিয়া এই ক্রমবজায় রেখে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ বা পদগুচ্ছ গঠিত হয় । বাক্যে শব্দ বা অর্থ গুরুত্বপূর্ণ বলে – দুটোদিকেই সচেতন থেকে বাক্যগঠন করতে হয়৷ এবং সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম বা নিষধকে অতিক্রম করলে যদি গঠন বা অর্থের অঙ্গহানি ঘটে তবে তা নিষিদ্ধ । সেইজন্য শুদ্ধ বাক্যের তিন শর্ত – আকাঙ্খা, যোগ্যতা, আসক্তি অনুসারে গঠিত বাক্যই অর্থপূর্ণ বৃহত্তর সংগঠন বলে বিবেচিত হয়৷

পুরাতন ব্যাকরণ চিন্তানুযায়ী গঠণগত দিক থেকে বাক্যের তিনটি বিভাগ – সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য । এই তিন প্রকার বাক্যের গঠনরীতি বা অন্বয় ভাবনার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে গেল আধুনিক বাক্য বিশ্লেষণের আরো সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনায় । সেখানে বাক্যকে একটি এক (Unit) ধরে তার প্রতিটি অংশ অর্থাৎ পদগুচ্ছ থেকে ক্রমশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠন বিশ্লেষিত হয়৷ বাংলা বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় এই নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগে বর্তমানে অন্বয়তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়৷ এই নিরীখে বর্তমান মান্য বাংলাভাষার বাক্যরীতির সাথে তুলনামূলক আলোচনায় আমার আলোচ্য নন্দীগ্রাম অঞ্চলের কথ্যভাষারীতির বাক্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হবে দৃষ্টান্ত সহযোগে৷

ক্রিয়ারকাল আলোচনায় আমরা দেখছি মান্য বাংলাভাষার বচন ও ক্রিয়ার কালরূপের বেশ ব্যবধান আছে – মান্যবাংলাচলিত ভাষার সাথে নন্দীগ্রামের কথ্যবাংলা ভাষার৷ মান্য কথ্যবাংলার বর্তমান রূপ লেখ্যচলিত বাংলার সাথে এক৷ কিন্তু এই অঞ্চলে কথ্যবাংলার তেমন কোন মাণ্যীকরণ ঘটেনি । দীর্ঘকাল ধরে লোকমুখে এভাষা কথিত হয়ে চলে আসছে । শব্দ উচ্চারণ, ধ্বনিতত্ত্ব , রূপতত্ত্বের বহু বৈচিত্র এই ভাষায় আছে৷ একস্থান থেকে সামান্য দূরে অন্যস্থানের ভাষার উচ্চারণ আলাদা হয়ে যায়৷ কোন অঞ্চলের ভাষা অত্যন্ত দ্রুত আবার কোন অঞ্চলের ভাষা বেশ ধীর গতির । একটা স্বতন্ত্র টান বা সুর কথার উচ্চারণে মিশে থাকে৷ আর তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সূক্ষ্ম-ধ্বনি পার্থক্য । আর সেই কারণে শব্দের রূপ৷ অর্থ এমন কি বাক্যের পরিচয়ও পাল্টে যায়৷ একটি ব্লক থেকে অন্য ব্লকের ভাষায় বিস্তর ব্যবধান৷ একটি ব্লকের দুই সীমানার ভাষায় দেখা যায় লক্ষণীয় পার্থক্য৷ পাশাপাশি দু-চারটি গ্রামের মধ্যে, জনগোষ্ঠীতে, জাতপাতের পার্থ্যকে এমনকি পাড়ায় পাড়ায়ও ভাষাগত ব্যবধান দেখা যায় । আরো সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখাযায় একজন ব্যক্তির কথ্যভাষা স্থান কাল পাত্র ও অবস্থার ভিন্নতায় আলাদা হয়ে যায় । উচ্চারণ শৈলীতে সেই ব্যবধান বেশ অনুধাবন করা যায়৷

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই স্থানগত সামান্য দূরত্বের কারণে এমন লক্ষ্যণীয় ভাষাগত ব্যবধানের কারণ কী? বাইরের কোন ভাষাগত প্রভাবত এ অঞ্চলে নেই । আসলে এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী জেলার অংশ । নদীনালা খালবিল এখানে প্রধান । বেশিরভাগ লোকজন কৃষিনির্ভর দরিদ্র মানুষ। তাদের জীবনসংস্কৃতিতে আছে কৌমরীতি । পথঘাট যোগাযোগ তেমন ছিল না । পূর্বদিকের শহর হলদিয়ার সাথে যোগ অতি সামান্য । কারণ মাঝে আছে হলদী নদী । এই নদীই যেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আলোচ্য অঞ্চলকে উত্তরে নরঘাট বর্তমানে মাতঙ্গিনী সেতু – ছুঁয়ে চলেগেছে পটাশপুর এগরা পর্যন্ত। আর দক্ষিণে কালিনগরের নদী পর্যন্ত যেন এই এলাকার মানুষের বসতির বিস্তার। ফলে এই অঞ্চলটি প্রায় নদীবেষ্টিত। ফলে লোকজন নিজেদের এলাকার বাইরে খুব একটা আসা যাওয়া করতো না । মূলতঃ নিজেদের এলাকায় ছিল তাঁদের সীমাবদ্ধ জীবন সংস্কৃতি । ফলে ভাষার তেমন কোন বিনিময় ঘটেনি। এক এলাকার মানুষের ভাষা অন্য এলাকার সাথে অপরিচয়ের দূরত্বে অপ্রভাবিত মূল রূপেই রয়ে গেছে। আধুনিক শহর কোলকাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ কার্যত এই শতাব্দীতে। নৌকাবাহন থেকে নদীর মুক্তি ঘটিয়ে কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গে তার সড়কপথে নিত্যযোগাযোগ ঘটেছে খুব বেশি হলে বছর পঁচিশ । তাই এই অঞ্চলের কথ্যভাষার মধ্যে দু'একটা ব্লকের পার্থক্যে অনেক ব্যবধান দেখা যায় ।

বর্তমানে এই জেলায় আধুনিক সভ্যতার জোয়ার লেগেছে । গণমাধ্যম মোবাইল সংস্কৃতির দ্রুত প্রসারের ফলে আধুনিক ভাষার প্রভাব খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে তরুণ সমাজের মধ্যে। তারা বাড়িতে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে এই অঞ্চলের ভাষা তার মূলরূপ থেকে আসতে আসতে সরে আসছে বা মৌলিকত্ব হারাচ্ছে। প্রবীন মানুষ, নিরক্ষর মানুষ, দরিদ্র অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী, গ্রাম্যনারীরা এই ভাষাকে এখনো অনেকটা ধরে রেখেছে । কিন্তু আগের মত প্রাচীন প্রভূত রূপ আর এই ভাষার মধ্যে বেশিদিন পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

মুখের ভাষা শুনে শুনে শেখা । সেখাই কানই একমাত্র ভরসা। প্রথাগত অনুশাসনে সে ভাষার জিহ্বা কেন্দ্রিক অনুশীলন নেই। ভাষার মত করে জিহ্বা প্রস্তুত করা হয় না । জিহ্বার স্বাধীন গতিতে এ ভাষার উচ্চারণ চলে। তার ফলে স্বাধীনতার অবকাশে বিচ্যুতিও ঘটে খুব। একব্যক্তি থেকে অন্যব্যক্তির উচ্চারণে পার্থক্য ঘটে । ঠিক ভুল বিচারেরে ও ভুল সংশোধনের প্রয়োজন অবকাশ কোনটিই নেই। তাই এভাষা অনেক ক্ষেত্রে মান্যবাংলা বাক্যের গঠনরীতি জানে না। তাই প্রথার প্রভাব ও প্রমালঙ্ঘন এ ভাষার স্বাভাবিক ধর্ম।

এই অঞ্চলের কথ্যভাষার অন্বয়গত বা বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সূত্রাকারে নিম্নে আলোচনা করা হল।

১। প্রথাগত ব্যাকরণের কর্তা – কর্ম- ক্রিয়া পদ রীতির মত এই ভাষায় বাক্যগঠন রীতি হলেও পদে পদে তার অন্যথা ঘটেছে । যেমন –

(ক) বাক্যের আদিতে কর্তা ব্যবহৃত হয় । যেমন – আমি বাজার যাইত্নি / যাইথিল । এখানে মান্যবাংলার গঠন আছে। 'আমি' কর্তা প্রথমে বসেছে ।

(খ) আবার বাক্যের মাঝে বা অন্ত্যে অনায়াসে কর্তা বসে যায় । যেমন- তাদেরকে আমি সকাবা যাইত্নি একবার । (অর্থঃ- তার বাড়িতে আমি সকালে গিয়েছিলাম একবার), এত করিয়া কইলি গেলনি একবার লোকটা। (অর্থঃ- এত করে বললাম তবু গেলনা একবার লোকটা)।

উপরের দুটি বাক্যে 'আমি' ও 'লোকটা' কর্তা হয়ে বাক্যের মাঝে অন্ত্যে ব্যবহৃত হয়েছে । এমন উদাহরণ প্রচুর দেওয়া যায় । যেমন – ১। কাল ফোন কত্ন মেইঝিটা। ২। মাজু একদিন আসত্ন সৌ বুড়া। ৩। কাইয়ার রে তুই ? ৪। ছ' সাত মাস ক্যানা বয়স হইল / হয়াল টকাটার। (ছ সাত মাস মত বয়স হ'ল বাচ্চাটার)।

আসলে বাক্যের যেখানেই কর্তা থাক না কেন উচ্চারণের সময় শ্বাসাঘাত ও তীব্রতার দ্বারা কর্তার অস্তিত্ব বোঝা যায়। শূন্য বিভক্তি চিন্তা করা কথকের জন্মান্তরের বোধেও নেই।

(গ) বাক্যের আদিতে সাধারণ বাক্যে প্রায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-

১। বক্তাঃ- কাই যাইত্ন ? উত্তর – যাইত্নি বাজারেরমা (বাজারের দিকে গিয়েছিলাম)

২। বাঁচবো কাইনু যে দিন কা আস্সে। (বাঁচবো কোথা থেকে যেদিন কাল এসেছে)

৩। প্রশ্নঃ- কী রে, কইনু আইলু ? উত্তর- কথাইতে যাইত্নি দাসে দরকে । (দাসেদের বাড়িতে খেতে গিয়েছিলাম)

এই উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে বাক্যের আদিতে সমাপিকা (যাইত্নি, বাঁচবো) এবং অসমাপিকা (খাইত) ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবাদেও এমন বাক্যরীতি পাই । যেমন –

অঃ শ্যামসুন্দর পুরের হাঁড়ি
থির কর্যা রাখরে রাঁড়ি
ধরবু যদি কস্যা
হাঁড়ি যাবে খস্যা (প্রবচন)

দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রথমে আছে – অসাপিকা ক্রিয়া 'কর্যা' এবং ক্রিয়া বিশেষণ 'থির'। বাক্যের মাঝে আছে অনুজ্ঞা – 'রাখ' সম্বোধন – 'রে' এবং শেষে আছে কর্তা 'রাড়ি'।

আঃ মরিছে খুড়ি খাঁচিছে ঠ্যাং (খুড়ি বা কাকি মরেছে তার প্রমান পা শক্ত হয়েগেছে)

ইঃ খাউনি খাঁড়িয়া জানবু কী / চিতি কাঁকড়ার কতকী ? (চিতি কাঁকড়া খুব স্বাদু খাবার। তুই মুসলিম (খাড়িয়া) তো। তাই খাস না, এই জন্য জানিস না)। মুসলিমরা চিতি কাঁকড়া খায় না।

(ঘ) বাক্যের আদিতে কর্মও ব্যবহৃত হয় এই অঞ্চলে। যেমন- ১। ভাত দিবে কইছে আইজ দাক্তর। ২। ভাত রান্দিয়া লিইছে তানে হাঁসপাতাকে। অর্থঃ- রোগীকে আজ ভাত দিতে বলেছে ডাক্তার। তাই ভাত রান্না করে নিয়ে গেছে তারা হাসপাতালে।

অনুবাদটি শুনলে বোঝা যাচ্ছে যে মান্যবাংলার বাক্যে যে ধরণের গঠন সাম্য থাকে সে নিয়ম এখানে মানা হয় নি। এরকম- দশটা টাকা ধার দুব আমাকে !

(ঙ) এই অঞ্চলের একটি প্রবাদে , নারী সংসারে তার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করে বলেছে-
'ভাত দেয় কি ভাতারে ?
ভাত দেয় গতরে'।

এখানে কর্ম এবং বিধেয় অংশ বাক্যের প্রথমে এসেছে। আর উদ্দেশ্য 'ভাতারে' , 'গতরে' ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের শেষে। এরকম অজস্র উদাহরণ থেকে বলাযায় – নন্দীগ্রাম অঞ্চলে বাক্যের উদ্দেশ্য গঠন ও বিধেয় গঠনের অবস্থান পরিবর্তন প্রায়ই ঘটে থাকে। যেমন – খাবা হইছে আমানকের দেখছ তুমানে। কাক্কো কুন কইনি আমি। কোন বিশেষ আবেগ ছাড়াই কর্তা ও উদ্দেশ্য বাক্যের শেষে বসে।

উক্ত তিনটি বাক্যে – আমানকের, তুমানে, আমি তিনটি কর্তা এবং উদ্দেশ্য বাক্যের শেষে আছে। আর বিধেয় অংশগুলি আছে বাক্যের প্রথমে। বিশেষ মানসিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা আরো বেড়ে যায় বাক্যগঠনে। যেমন – আমি সেটিকে যাবনি, আগুন কয়া দিইটি। কখনো কখনো পুরো বাক্যটিই উল্টে যায়। যেমন – খেলেটে টাকামনে সেটি, লেইসেনি আইজ বাজারনু।

গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার – সরল, জটিল ও যৌগিক। এই অঞ্চলের ভাষায় তিনধরনের বাক্যের গঠনে কিছু বিশেষত্ব আছে।

(ক) সাধারণতঃ খুব ছোট সরল বাক্যই ব্যবহৃত হয়। ভাত খাইছি। আমি বাজার যাইত্রি। যা পাইছি লিয়াস্সি। কী কইথল খাবনি আমি। তোনে বুস্যা র অ সারাদিন। ইত্যাদি।

(খ) সরল বাক্যে একাধিক বিশেষ্যপদ থাকলে শেষ বিশেষ্যের আগে 'আর' সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। মান্যবাংলার মতো 'ও' হয় না। যেমন- দেবু, ভালো আর আমাহারে সোনা যাবে।

*প্রশ্নবোধক বাক্য মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থে হলে – সাধারণ সম্বোধন উল্লেখ থাকে বাক্যের শেষে। কাই যাহরে তুই।

*অসমাপিকা ক্রিয়াপদ থাকে বাক্যের শেষে। যেমন- রাখিয়া প্যায়স্সু ভুলে।

(গ) নিকটের নির্দেশমূলক বা প্রশ্নসূচক বাক্যে কর্তার অনুল্লেখ একটি বিশেষ লক্ষণ। যেমন –
প্রশ্ন- ওঠি কী করটে ? উত্তর- বাঁকি বসকাইটি। আর জাল আড়িয়া দেস্সি।

অচেনা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক সরলবাক্যে সম্বোধন পদটি থাকতে পারে না ও থাকতে পারে। যদি থাকে তবে তা বাক্যের শেষে থাকে। যেমন - * কাই যাবা হবে।
*একটু সারিয়া বুস।
* আপনার বাড়ি বহন্টিগো বাবু ?

প্রশ্নঃ- কী কট্টুরে (কী করছিস রে)

উত্তরঃ- পড়িটি – শুধু ক্রিয়াপদটি এখানে একটি সরলবাক্য।

(ঘ) জটীলবাক্যের ব্যবহার খুব কম। অল্প কিছু ক্ষেত্রে হলেও সে বাক্যের আয়তন খুব ছোট। যেমন-

১। যাইনু লেসসু সৌটি রাখ্যায়।

২। যৌ দেশে যাই যৌ ক খাই।

তবে জটীলবাক্যে ব্যবহৃত সাপেক্ষ সর্বনাম বা নিত্য সম্বন্ধী অব্যয় ব্যবহারে এই অঞ্চলের ভাষা মান্যবাংলার থেকে অনেক সময় পৃথক হয়। মান্যবাংলার জটীলবাক্য দুটির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১। জানাত যদি তাই লেকি আর দিতি। ২। বড় টকা হইত্ন যেবছর সেবছর কন্যা হইত্ন। ৩। কথা কইতে আসত্ন যা-নে ধরা তানকে।

এখানে নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে দুটি বাক্যের শেষে। এখানে (যদি) – তো (তাহলে) ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের মাঝে। এরকম অনেক কথ্য এই অঞ্চলে অনেক সময় বাক্যের মাঝে ব্যবহার করা হয়। যেমন-

*তুই যেদ্না কইবু আমি যেদ্না যাবো। (তুই যেদিন বলবি আমি সেদিন যাবো)

*ঠাকুর যাবি চাইবে তুই তবি পাবু।

(চ) নিত্য সম্বন্ধী অব্যয় ও সাপেক্ষ সর্বনামের দুটি অংশের মধ্যে একটি অংশ ব্যবহার প্রবণতা খুব দেখা যায়। এবং যদি প্রথমটি ব্যবহৃত হয় তবে তা প্রথম বাক্যের শেষে থাকে। যেমন-

*আসত্ন যখন আমি কাই থাইলি ?

*যেদরকে ডাকত্ন যেদো আমি যাইনি।

*তুই লবু যেদি লিয়া যা (যদি তুই নিবি তো নিয়ে যা)

*আইজ আস্সেনি যখঁ কাল ঠিক আইস্যাবে।

*তুই কয়িত্নুনা / কইইত্নু না , সৌটা তবিনু ভাবিটি। - এই বাক্যে 'সৌটা' ও 'তাবিনু' দু'টি নিত্যসম্বন্ধী পদের পরবর্তী অংশই শুধু ব্যবহৃত হয়েছে।

(ছ) যৌগিক বাক্যে সংযোজক অব্যয় 'আর' ব্যবহার হয় সর্বত্র। যেমন –

*তুই জানু আর তোর মা জানে।

*ছেলেটা পড়াশুনা করে আর ক্রিকেট খেলে।

বিয়োজক অব্যয় রূপে 'তোরা' (তাসত্ত্বেও) , বাছে (কিন্তু), বঞ্চচ (বরঞ্চ)।

যেমন- *আমি যাইত্নি বাছে সে আইনেনি।

*লোকটা খাইতে পায়নি ভেবো কারোর জিনিসে হাত দেয়নি।

৩। এই অঞ্চলের বাক্য ব্যবহারে ভাববাচ্যের

(ক) প্রাধান্য বেশি। দেখা যায় হলেই লোকেচেনা মানুষকে জিজ্ঞাসা করে –

* কাই গো কী হ'টে ? (কী করছে ?)

* তোনকের খাবা হইছে ?

উত্তরে লোকে বলে – হঁ খাবা হইছে। ইযে খাবা হ'টে। ধান কাটা হ'টে খেয়েছি, খাচ্ছি, কাটছির স্থলে ভাব বাচ্যের বিভক্তি যুক্ত হয়।

(খ) অচেনা আগুন্তুকের সাথে বাক্যালাপের যখন ঠিক বোঝা যায় না যে 'তুমি' না 'আপনি' কোন সম্বোধনটা ঠিক হবে – তখন এই অঞ্চলের ভাষায় নিরাপদ ভাববাচ্যের ব্যবহার ঘটে।

বাবু, কোথা থেকে আসা হচ্ছে ? কার বাড়িতে যাবা হবে ? আপনি সম্বোধন করেও বলে – আপনার কী কাজ করা হয় ?

(গ) বাড়িতে যখন নিকট জনের সাথে কথা হয় তখন মান অভিমান ইত্যাদির কারণে অনেক সময় অনুভবে – দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এর ফলে ভাববাচ্যে কথা বলা হয়। যেমন –

১। তুমার যা ভালো লাগে সৌটা করা হউ।

২। খরচ হইলে আর কী করা যাবে , করতে হবে।

৩। তুমাকে কআ হইত্নি ? (তোমাকে ফোনে বলেছি না ন না ?)

৪। প্রঃ- আইজ আসা হইছে, কবি যাবা হবে ?

উঃ- দেখা যাউ, কবি যাবা হবে।

৪। এই অঞ্চলে বাক্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রচুর। যেমন-

ক। তেল নিয়ে এলাম – তেললিয়া কর্‍যা চলিয়া আইলি। তেল লিয়াইলিও বলে।

খ। ছুটিয়া যায়া করিয়া লিয়া চলিয়া আইসবু।

গ। ভাত খেয়ে ঘুমোচ্ছিলাম > ভাত খায়া করিয়া ঘুমি থাইলি।

ঘ। খেয়ে বসে আছি > খায়ালিয়া করিয়া বসিয়া আছি।

চারটে অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে 'লিয়া', 'করিয়া' অতিরিক্ত বাক্যটি মান্যবাংলায় হয় – খেয়ে বসেছি।

৫। এই অঞ্চলের বাক্যে উদ্দেশ্যের প্রসারক উদ্দ্যেশের পরে বসে বেশি।

রমেশ যে মিষ্টিদোকান কচ্ছে তোকে যাইতে কইছে সন্দিয়াবা। - বাক্যটি মান্যবাংলায় হবে

'মিষ্টি দোকানদার রমেশ তোকে সন্ধ্যাবেলা যেতে বলেছে'।

এখানে 'মিষ্টি দোকানদার' সংগঠনটি 'রমেশ' এই উদ্দেশ্যের প্রসারক। নিয়ম অনুযায়ী তা কর্তা বা উদ্দেশ্যের আগে বসেনি। বসেছে পরে। তবে সাধারণতঃ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের প্রসারক ব্যবহার করে দীর্ঘ বাক্য বলার অভ্যাস এই অঞ্চলের বাক্য প্রয়োগে দেখা যায় না।

৬। (ক) বাক্যে গো, আগো, প্রভৃতি অব্যয় সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নকর্তার বাক্যে 'গো' থাকে বাক্যের শেষে। আর উত্তর দাতার বাক্যের শুরুতে থাকে 'আগো'।

প্রশ্নকর্তাঃ তুমানে কাই যাব গ, একটুজ অ দওনাগ। তুমানে সক লোক ভাল আছ গ।

উত্তরদাতাঃ আগো আমার বোড়ো ঝির দরকে যাইটি।

শিশুরা বাল্যকাল থেকে এইভাবে বাক্য বলতে শেখে। মাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে উঠানে খেলায় ব্যস্ত অবুঝ শিশু যখন – মা কাই যাব গ ? রেগে মা যদি উত্তর দেয় – মড়া চুলকে যাব (মরতে যাব)। তখন শিশু আবদারের সুরে বলে 'আমি যাব গো'। এইরকম – কী হবে গো, কাই যাব গো, কী রকম গো, কেন দিলনিগো ইত্যাদি সচরাচর শোনা যায়।

(খ) বয়সে ছোট পরিচিত জনকে সম্বোধন করা হয় 'ওয়' দিয়ে আর প্রশ্নের শেষে থাকে 'রে' (ওরে)। মান্যবাংলায় বাক্যের শুরুতে থাকে – তুচ্ছার্থবাচক আবেদনের শব্দ 'ওরে'। যেমন-

১। ওয়, তোনে, অথবা দুকোর্বা কাইযাবু রে / র্‍যা ?

২। আমি দাঁড়ি আছি – আয়রে।

(গ) বাক্যের শুরুতে 'ওরে' র পরিবর্তে 'আরে' ব্যবহৃত হয় কখনো কখনো। যেমন –

১। আরে কেকাই আছু বারিপড় ভূমিকম্পহ অটে।

২। আরে কাই থাইল অ্যাদ্দিন। ম্যাল্লাদিন পরে দেখলি।

(ঘ) এই অঞ্চলে বাক্যে 'হায়' অব্যয়টি ব্যবহৃত প্রথমে। অনেকদিন পরে কোন চেনা লোকের সাথে দেখা হ'লে বা সে লোক বাড়ি এসেছে – দেখা হ'লে খুশি হয়ে বলে – 'হায়' কবি আসস ? ভাল আছ। এটি সম্মানার্থ থেকে তুচ্ছার্থ সবক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন –

১। হায় ! মাস্টার কবি ঘর আইল।

২। হায় ! তুই কবি আসসু !

আবার নির্দেশক অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয় – ১। হায় সৌটি দঁড়ে বুস্তিলি, ২। হায় সৌ লৌকটা কইত্ল।

৩। আমি হায় দকানেরমা যাইত্লি।

এটি ইংরেজি '**Hi**'বা শোকবাচক '**হায়!**' নয়।

(ঙ) আবেদনসূচক বাক্যের শেষে সম্মানজ্ঞাপনার্থে 'মশয়'(মহাশয়) শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এতে বক্তার বিনম্র মানসিকতা ফুটে ওঠে। যেমন –

১। আমার কথাটা একটু শুণমশয় !

২। অতধূরনু বালি যালি, লোকটা ঘরে আছে তোবো একবার দেখাকরলিনি মশয়।

এমনকি রাগ ঘৃণা বিরক্তি প্রকাশ করে যাকে সেই অচেনা বা চেনা ব্যক্তিকেও 'মশয়' বলে সম্বোধন করে। যেমন –

১। তুমাকে ভোট দিয়া আমানকে কী লাভ হইছে মশয় !

২। তুমি আমার যা ক্ষতি করছ – আমি তা ভুলব নি মশয় !

(চ) নঞর্থক অব্যয় 'না' সমাপিকা ক্রিয়ার পড়ে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে একই রূপে বসাই মান্যবাংলার দস্তুর। নন্দীগ্রামের কথ্যবাংলায় সমাপিকা ক্রিয়ার পরে হয় 'নি' এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে হয় 'নাই'। যেমন –

১। তুমানকের সাহায্য নাই পাইলেও মরব নি।

২। টাকা যদি নাই দ্যায় তবু আমি মাগবনি।

৩। নিমন্তনে নাই যাবতু, গাধুয়া ঘরে খায়া লে।

(ছ) মান্য বাংলাভাষার প্রশ্নবোধক অব্যয় 'কেন?' এই অঞ্চলের ভাষায় হয় 'কেনি'। যেমন-

* তুমি আমাকে নাই জিগসি তাকে টাকা দিছ কেনি ?

* তুই এঠিকে আস্স কেনি ?

* ও টকা কান্দুটা কেনিরে ?

মান্যবাংলায় এই 'কেন' অব্যয় ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। তবে এই অঞ্চলে 'কেনি' প্রধাণতঃ ব্যবহৃত হয় বাক্যের শেষে।

(জ) নিকট সম্বোধনের গো, রে, - দূর সম্বোধনে প্লুতস্বর হয়ে যায়। যেমন- কচি রে এ এ এ, দাদারে এ এ এ, মাগো ও ও ও। জলা জঙ্গল খালবিলের দেশে দূরে ডাক পাঠাতে প্লুতস্বরের ব্যবহার আবশ্যক হয়ে পড়ে।

৭। মান্যবাংলা ক্রিয়ার কালগত ঐক্য রাখতে হয়। কিন্তু অনেক লেখায় সেই কালগত ভারসাম্য লঙ্ঘিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে ভাষাবিদ ড. রামেশ্বর শ। এই অঞ্চলের কথ্য বাংলায় এরকম ক্রিয়া ও তার কালগত ঐক্য অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় না। যেমন-

ক) তানে খুব কর্যা ধত্ত্ব বা আমানে থাইনি / রইনি / থাইছিনি / রইছিনি ইত্যাদি রূপ ব্যবহৃত হয়।

খ) অনেক বছর আগুকর্যার কথা। তখন আমি কলকাতায় থাই। - এখানে অনেক আগেকার কথা অর্থাৎ অতীতকালের কথা বলা হলেও বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে 'থাই' (থাকি) ব্যবহৃত হয়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপের স্থায়ী স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

(ক) নন্দীগ্রাম অঞ্চলের পুরাঘটিত বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের যে রূপ তার মান্য বাংলাভাষার ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ার সমান। আমি বইটি পড়ছি – মান্যবাংলায় অর্থ আমার বইপড়া কাজটি চলছে (**I am reading the Book**) নন্দীগ্রামের ভাষায় তার অর্থ বইটি আমার পড়া হয়ে গেছে (**I have read the Book**)।

(খ) নন্দীগ্রাম অঞ্চলের নিত্য অতীতকালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়ারূপের মান্যবাংলাভাষার নিত্য অতীতকালের মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থে ক্রিয়ারূপ এক।

আমি পড়লি – (মান্যবাংলায় আমি পড়লাম)

তুই পড়লি – (তুই পড়লি।-------)

(গ) নন্দীগ্রামের ভাষায় নিত্য অতীতকালে সম্মানার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের এবং প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের একই রূপ। এই ক্রিয়ারূপ ও মান্যবাংলার নিত্য অতীত কালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়ারূপ এক। যেমন – পড় ধাতুর ক্রিয়ারূপ পড় + ইল = পড়িল > পড়ল – নন্দীগ্রামের উক্ত তিন স্থলেই অপরিবর্তিত। মান্যবাংলায় এটি কেবল নিত্য অতীতের সাধারণ প্রথম পুরুষে দেখা যায় -সে পড়ল।

(ঘ) নন্দীগ্রামের ভাষায় যে কোনকালের মধ্যম পুরুষের সম্মানার্থ ও সাধারণ উভয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপ এক। অর্থাৎ সাধারণবাচক ক্রিয়াপদ। যেমন – তুমি পড়। আপনি পড়। এখানে আপনির ক্ষেত্রে ‘পড়েন’ হয় না। এই স্বাতন্ত্র্যকে আলোচ্য অঞ্চলের ভাষার বিকৃতি বলা চলেনা। এটি তার স্বকৃতি বা আকৃতি। মান্য চলিতবাংলা সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই এই রীতি এই অঞ্চলে চলে আসছে।

(৮) নন্দীগ্রাম অঞ্চলে শব্দ ও ক্রিয়াপদের মতো বাক্যকেও সংকুচিত করা হয়। অনেক ধ্বনি লুপ্ত হয় , অনেক ধ্বনি সংকুচিত হয়। ফলে উচ্চারণ বাক্য ছোট হয়ে যায়। যেমন-

ক) সে কী লেইছে দ্যাখেতয়াচ্ছুনি।

খ) কী দ্যাস্সে দ্যাখত্যাইছুনি।

গ) তুই পইসা দেল্সু ?

ঘ) বইটা নক্লিছে।

তিনটি বাক্যের অর্থ যথাক্রমে – ক) সে কী নিয়ে গেছে দেখতে পারিস নি। খ) কী দিয়ে এসেছে দেখতে পাসনি। গ) তুই পয়সা দিয়ে এসেছিস। ঘ) বইটা নকল করে দিয়েছে। অর্থাৎ হাতে লিখে আর একটা কপি করে দিয়েছে।

(৯) এই অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণ অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন। দীর্ঘ পরিচয় ছাড়া উচ্চারণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনির উপস্থিতি অনুধাবন করা সম্ভব নয়।